ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অব-উপনিবেশিকরণঃ উত্তর-ঔপনিবেশিক জনপ্রিয়তাবাদীর দল ও কয়েকটি নৈতিক সঙ্কট

কিরা হিউয়ু

২৫ মার্চ, ২০২৪

গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানশিপের (আইআর) ক্রিটিকাল স্কলার হিসেবে এই বিষয়ের "অব-উপনিবেশিকরণ" বা "ডিকলোনাইজেশন" নিয়ে কাজ করার সময়, আমি আমার চাহিদা সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে শিখেছি। অ্যাকাডেমিক জ্ঞানের অব-উপনিবেশিকরণের অর্থ হল, চিন্তা ও অন্বেষণ, ঐতিহাসিকভাবে মূলত পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক হলেও, যাকে বিশ্বজনীন তকমা দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রশ্ন করা। এর উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক মাপকাঠি ও অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে হিসেবে পাশ্চাত্যকে স্থানচ্যুত করা এবং সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার কত রকম ভাবে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে রূপদান করে, সেগুলিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা। তবে, অব-উপনিবেশিক আত্মীকরণ বা ডিকলোনিয়াল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান নিয়ে অ্যাকাদেমিকদের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে। নানা জাতীয়তাবাদী, নেটিভিস্ট ও রক্ষণশীল উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য অব-উপনিবেশিক মুক্তির কেতাদুরস্ত ভাষাকে সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়।

কসমোপলিটান এলিটসঃ ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটস অ্যান্ড দি সোশ্যাল হায়ারার্কিজ অফ গ্লোবাল অর্ডার (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২৩) নামের বইতে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, আনুষ্ঠানিকভাবে অব-উপনিবেশিত আন্তর্জাতিক সমাজেও, ভারতীয় কূটনীতিবিদরা বেশ অপটুভাবে এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেন।। বৈচিত্র ও ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক আন্তর্জাতিক সমাজ নির্মাণের অভিমুখে এগিয়ে চলার অকৃত্রিম অভিলাষের পাশাপাশি, শ্বেতচর্মাবৃত, ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত একটি সমরূপী ও সমজাতীয় গোষ্ঠী, সামাজিকভাবে যার অংশভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় কূটনীতিবিদদের কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক, সেই গোষ্ঠীর একটি অতিরঞ্জিত ধারণার উপর দীর্ঘ আস্থা দেখা যায়। এই কূটনীতিবিদরা যখন পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আধিপত্যকে সরোষে আক্রমণ করেন, এমনকি তখনও তাঁদের মধ্যে এমন সব সামাজিক আচরণ দেখা যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে, যাদের জাতি ও শ্রেণীর উচ্চতায় তাঁরা উত্তীর্ণ হতে চান সেই পশ্চিমীকৃত অভিজাত গোষ্ঠীর অভিজাত সদস্য হওয়ার আকুল কামনা তাঁদের মধ্যে আছে। চিরাচরিত রাজনৈতিক তত্ত্ব কসমোপলিটানিজম বা সার্বজনীনতাবাদকে বিশ্বব্যাপী সহনশীলতার প্রতি আদর্শগত অঙ্গীকার, অর্থাৎ একটি *সমতাবাদী নৈতিকতা* হিসেবে দেখে। এই রকম সামাজিক প্রেক্ষিতে, সার্বজনীনতাবাদকে এই দৃষ্টিতে না দেখাই উচিত আমাদের। তার পরিবর্তে, আমাদের প্রয়োজন সার্বজনীনতাবাদকে একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির মাধ্যমে দেখা। অর্থাৎ, সার্বজনীনতাবাদ আদতে একটি *অভিজাত নান্দনিকতা* এবং এমন একটি সামাজিক মাপকাঠি, যা ধরে নেয় যে, ইংরাজিভাষা-কেন্দ্রিক অভিজাত আলাপের বিষয়ে সাংস্কৃতিক সাবলীলতা এবং পশ্চিমী উচ্চশ্রেণির রীতিনীতি ও আচার-আচরণের আত্মীকরণ ঘটবেই। সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার কিভাবে আজও ভারতীয় কূটনীতির রূপ নির্মাণ করে, তার একটি উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী সমালোচনা এবং একটি বিস্তৃততর ও অব-উপনিবেশিকৃত সার্বজনীনতাবাদ ঠিক কেমন দেখতে হতে পারে, তার একটি চিত্র এই বইটি তুলে ধরে।

তবে, ভারতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অব-উপনিবেশিকরণের অর্থ অনেকগুলি নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে আহ্বান করা। তত্ত্ব সর্বদাই ক্ষমতাশালী; রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের গুরুত্বও অপরিসীম। সমসাময়িক ভারতের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, অব-উপনিবেশিকতাবাদ নিয়ে যাঁদের সব চেয়ে বেশি উৎসাহী বলে মনে হয়, অনেক সময়ই তাঁদের রাজনৈতিক বোধ এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পাণ্ডিত্যের মূল নৈতিক ভিত্তির বিপরীতে যায়।

এই অভিনেতাদের আমি "উত্তর-উপনিবেশিকতাবাদী জনপ্রিয়তাবাদী" বলে অভিহিত করে থাকি। নরেন্দ্র মোদীর ভারত ও রিসেপ তায়িপ এরদোগানের টার্কি থেকে তাঁদের মতামত ভিন্ন হতেই পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল সূত্রটি হল, পশ্চিমের হাতে শোষিত হওয়ার ঐতিহাসিক আখ্যানটিকে অব-ঔপনিবেশিক মুক্তির একটি প্রকল্প হিসেবে সমসাময়িক স্বৈরাচারী রাজনীতিকে সাজিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় । "অ-পশ্চিমী সত্ত্বা"-কে একটি অকলুষিত ও রোমান্টিক নিম্নবর্গীয় হিসেবে দেখান হয়, যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত পশ্চিমী আরোপণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতে, "অব-উপনিবেশিত হিন্দুত্ব" হিন্দুত্ববাদের নেটিভিস্ট রাজনীতিকে পূর্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বামপন্থী ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। দেশের "পাশ্চাত্যপন্থী" ভিন্নমতাবলম্বী আকাদেমিশিয়ান এবং সাংবাদিক থেকে শুরু করে বিদেশের "সাম্রাজ্যবাদী" মানবাধিকার উপদেষ্টাদের মত কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক জাতীয়তাবাদের প্রকল্পটিকে বিক্রি করার জন্য ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাসকে এই মিলনটি আহ্বান করে। সমস্ত বিদেশী সমালোচনাকেই ভারতের সার্বভৌমত্বে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ বলে খারিজ করে দেওয়া হয়; ভারতীয় মস্তিষ্কের অব-উপনিবেশিকরণ যে অপর্যাপ্তভাবে ঘটেছে, সে বিষয়ে সমস্ত দেশীয় সমালোচকই একমত। ভারতের বিদেশীশক্তির উপনিবেশে পরিণত হওয়া, অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশদের হাতে নয়, আদতে তা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকে মুঘলদের ভারতে আগমনের সঙ্গে – এই আখ্যানটির প্রচলনের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস-সঙ্কলনবিদ্যা বা হিস্টোরিওগ্রাফি তার মুসলিম-বিরোধী রাজনীতিকে একটি অব-উপনিবেশিত রাষ্ট্র নির্মাণের পতাকার নিচে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী জনপ্রিয়তাবাদীরা সারা বিশ্বে যে আকাদেমিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি থেকে নিজেদের সুবিধা মত শব্দ বেছে নিয়ে সেগুলিকে দেশীয় প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করেন। এই প্রয়োগের একটি উদাহরণ হল, জে. সাই দীপকের *ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারতঃ কলোনিয়ালিটি, সিভিলাইজেশন, কনস্টিট্যুশান* এই বইটির জন্য অব-ঔপনিবেশিকতাবাদের তারকা তাত্ত্বিক ওয়াল্টার মিগ্নোলো একটি অনুমোদনমূলক প্রবন্ধ লেখেন, যেটিকে দক্ষিণ এশিয়ার পণ্ডিতদের সক্রুদ্ধ প্রতিবাদের পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। দীপক এবং তাঁর মত অন্যান্য উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী জনপ্রিয়তাবাদী, যাঁরা এই উদীয়মান চিন্তাধারাটির পক্ষপাতী, তাঁদের জন্য ভারতের আদি বাসিন্দা যেকোনো ভারতবাসী (বা, যেমন প্রত্যাশিত, ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়) নন, বরং বিশেষভাবে হিন্দুধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী, যাঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হাতে নিপীড়িত বলে বর্ণনা করা হয়। তিন হাজার বছরের জাতি বৈষম্যের ইতিহাসকে ঘিরে আদি ভারতীয়দের কোনরকম নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, এই বৈষম্যকে ব্রিটিশ রাজের একটি ঔপনিবেশিক নির্মাণ বলে প্রচার করা হয়। "পশ্চিমের প্রতি জ্ঞানমূলক অবাধ্যতা"-র অব-ঔপনিবেশিক ভাষাকে প্রয়োগ করে, দীপক

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে উপনিবেশবাদের অবশেষ হিসেবে অবমূল্যায়নের এবং হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। পাঠকের কাছে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে দেশীয়ের বন্ধনমুক্তি বলে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা এই বইটিতে করা হয়েছে।

যদিও, আমি যে "আত্মসাৎ" শব্দটি ব্যবহার করেছি, সেটি জালিয়াতি বা অবৈধভাবে অধিকার করার দিকে ইঙ্গিত করলেও, উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী জনপ্রিয়তাবাদকে দোষারোপের নৈতিকতাটি আদতে জটিল। প্রথমত, বিশেষ করে গ্লোবাল নর্থ থেকে যখন উচ্চারিত হয়, অব-ঔপনিবেশিকতামূলক বিতর্কের গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করার প্ররোচনাটিকেই গভীরভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন, কারণ এই ঘটনাকে প্রবলভাবে গ্লোবাল নর্থের তাত্ত্বিক আধিপত্যের অনুরূপ বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, অপরের বন্ধনমুক্তির বোধের বিপরীতে যায়, এমন অভিমত পোষণের অধিকার উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী কালে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অধিকার চর্চার অংশ হওয়া উচিত। বাস্তবিকই, এই সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার বিষয়টির পরীক্ষা একমাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন তা এই চর্চার অঙ্গ হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, এই অব-উপনিবেশিকতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত তত্ত্ব কখনই, শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী চরিত্রের কারণেই জাতীয়তাবাদী আত্মীকরণের সমালোচনা করে না। বিংশ শতাব্দী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ বিশ্বে পরিবর্তন আনতে পারে, এমন একটি অব-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব, যা যথার্থভাবেই পূর্বের যে জনতা নিপীড়িত অবস্থায় জীবন কাটাতেন, তাঁদের জন্য বৃহত্তর সার্বভৌম সাম্য নিশ্চিত করে। তার পরিবর্তে, আমাদের ফিরে যেতে হবে অব-উপনিবেশিকতার ভিত্তিমূলক তত্ত্বে, অর্থাৎ বৃহত্তর মুক্তির নামে অন্যায় ক্ষমতার কাঠামোকে প্রশ্ন করার দিকে। এথনো-ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়-রাষ্ট্রবাদমূলক প্রকল্পগুলি পুরাতন অবিচারগুলিকে চিহ্নিত করতেই পারে, কিন্তু সেগুলির বহিষ্করণ বা বর্জনের রীতি, যেকোনো ভিন্নতার সম্ভাবনা বলপূর্বক মুছে দেওয়া এবং নিপীড়ন আদতে বন্ধনমুক্তির ধারণাকেই বিদ্রুপ করে।

অব-ঔপনিবেশিকতার আকাদেমিয় কার্যাবলীটি কোথায় অবস্থান করে তাহলে? বুদ্ধিগত সংস্কারসাধনের দুটি দিক দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। আমার প্রথম আবেদন একটি রোমান্টিক দেশজতার বিরুদ্ধে। উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদী জনপ্রিয়তাবাদটি কাজ করে এমন একটি অনুমানের উওর ভিত্তি করে, যা ধরে নেয় যে একটি অদূষিত সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ববর্তী সময় ও সমাজের অস্তিত্ব আছে। এই পলায়ন-মূলক চিন্তাধারার পুরোভাগে আছে নৈতিকভাবে নির্দোষ প্রমাণিত দেশজ জনতা, যাঁরা পশ্চিমী আধুনিকতার নীতিভ্রষ্টতা থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং শুধুমাত্র তাঁদের দেশজ পরিচয়ের কারণেই যাঁরা পূর্বনির্ধারিতভাবে নির্দোষ। এই ধারণাটি অভিজ্ঞতার দিক থেকে অসৎ এবং রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। ভারতের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হল, বাস্তবে যা একটি অসাধারণ বিচিত্র ও সঙ্কর দেশ, এই ধারণার কারণে তা কল্পিত এক ঔপনিবেশিকতা-পূর্ববর্তী কালের একমাত্রিক ও অতিরঞ্জিত সংস্করণে পরিণত হয়েছে। এই রোমান্টিকতা এমন অনেক প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশেই প্রচলিত, যেখানে এর সাহায্যে দেশজতা বিষয়ক সমস্ত বক্তব্যের নেটিভজম ও এসেনশিয়ালিজমকে চাপা দিয়ে রাখা হয়, এবং যাকে ইদানীং কালে অব-ঔপনিবেশিকতামূলক আত্মীকরণ অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে উন্মুক্ত করছে।

দেশজতা নিয়ে রোমান্টিক ধারণার একটি প্রবণতা হল, তা ধরে নেয় যে একজন ব্যক্তির নৈতিকতা ও রাজনীতি তাঁর পরিচয়ের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। একটি নির্ধারিত গোষ্ঠী-পরিচয়কে উত্তরণ করে যে কোনও চিন্তা থাকতে পারে, তা অস্বীকার করার অর্থ একজন ব্যক্তিকে তাঁর জন্মগত সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও প্রেক্ষিতের চৌহদ্দিতেই আটকে রাখা। এই রকমভাবে দেশজতার "খাঁটিত্ব"-কে অবিরত প্রহরা দেওয়ার

অর্থ স্বাধীনতা নয়। এ কোনও কাকতালীয় বিষয় নয় যে, অব-উপনিবেশিত হিন্দুত্ব শুরুই হয় ভারতীয় মস্তিষ্ককে অব-উপনিবেশিত করা দিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছয় প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রী, অ্যাক্টিভিস্ট এবং আকাদেমিশিয়ানদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, "দেশদ্রোহী" বা যথেষ্ট ভারতীয় নয় বলে দেগে দেওয়াতে।

আমার দ্বিতীয় আবেদনটি হল, সংহতিমূলক বিশ্বজনীনতার একটি রূপের পুনরুদ্ধার। অব-উপনিবেশিক তত্ত্ব বিশ্বজনীনতার দাবির বিপক্ষে অবস্থান করে, কারণ এর মতে ঔপনিবেশিক মতাদর্শ আদতে একটি আংশিকভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অবস্থান থেকে বক্তব্য পেষ করার পাশাপাশি একটি মিথ্যা বিশ্বজনীনতার প্রচার করে। তা সত্ত্বেও, অতীতে বিশ্বজনীনতা যে অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, অনাধিপত্য-কেন্দ্রিক একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বের জন্য, আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিশ্বজনীনতাকে বিকশিত করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। ওলুফেমি ও. তাইয়ো যাকে "পরমতসহিষ্ণুতার রাজনীতি" – এখনকার একটি জনপ্রিয় প্রগতিশীল চর্চা যা সমালোচনা না করে "প্রান্তিকতমদের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে ও তাঁদের "যাপিত অভিজ্ঞতা"-কে পুনর্স্থাপিত করে – বলে অভিহিত করেন, তা পুনর্বিবেচনা করা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন। যেহেতু, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যরাই তাঁদের নিজস্ব সত্যকে বৈধভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাই গোষ্ঠীগুলি, এমনকি অনেক প্রজন্ম ধরেই, কোনকিছু সম্পর্কে ভুল হতে পারেন (বা মূলগতভাবে নিজেদের মধ্যে ভিন্নমত) তা দাবি করা আর সম্ভব নয়। এর ফলে আরও যা হয়েছে তা হল, আভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ বা নানা সাংস্কৃতিক বিভাজন জুড়ে ঘটে চলা বিতর্কেকে প্রসারিত করার মত যথেষ্ট সম্পদ আমাদের কাছে আর নেই।

উপরন্তু, পরিচয়ের সদা-সঙ্কুচিত শ্রেণীর প্রতি অতি-সংবেদনশীলতার কারণে সংঘবদ্ধভাবে কাজ বা চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদি, একটি যাপিত অভিজ্ঞতার অংশ হওয়াই গোষ্ঠী এবং নৈতিকতাকে বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমরা সংহতির সমস্ত সম্ভাবনাকেই নির্মূল করে দিচ্ছি, কারণ সংহতির সংজ্ঞা থেকেই প্রমাণ হয় যে, এর জন্য প্রয়োজন সহমর্মিতা এবং পরিচয়-কেন্দ্রিক বিবিধ ভিন্নতাকে ভুলে জোটবদ্ধ রাজনীতির চর্চা।

কসমোপলিটান এলিটজ বইটির জন্য আমি কয়েকজন ভারতীয় কূটনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। একটি উত্তর-পাশ্চাত্যবাদী বিন্যাসের আরম্ভক্ষণে একটি সার্বজনীনতাবাদের প্রকাশও যে সম্ভব, সে বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের অপ্রয়োজনীয় পশ্চিমীভাবাপন্ন, উচ্চবর্গীয়তাবাদী, বর্জনমূলক জাত্যার্থ থেকে একটি প্রাচীন ও অতিসংকীর্ণ জাগতিকতাকে সমূলে উপড়ে আনাই বিচক্ষণতার কাজ বলে মনে হয়। সার্বজনীনতাবাদকে পুনরায় কল্পনা করা সম্ভব।, অব-উপনিবেশিকতা এই পুনঃকল্পনার, সম্পূর্ণ না হলেও, অংশ হতে পারে। এবং তৎসত্ত্বেও, অব-উপনিবেশিকতার চেহারা কেমন হওয়া উচিত, তা অভিজ্ঞতামূলক, জ্ঞানমূলক বা নৈতিকভাবে স্পষ্ট নয়। অব-উপনিবেশিকতাবাদ তত্ত্বের অনেক সমসাময়িক ব্যাখ্যাই, হয় অজান্তে অথবা জ্ঞানত বৈদেশিক প্রতিবাদ ও আভ্যন্তরীণ মতভিন্নতার পরিসরকে আরও সংকীর্ণ করে দেয়। এই সংকীর্ণ করাকে অব-উপনিবেশিকতার নামে সারা বিশ্বের স্বৈরাচারীরাই সাদরে গ্রহণ করেন। তত্ত্ব "বাস্তব পৃথিবী"-তেই বিরাজ করে এবং তা সদাই রাজনৈতিক। এই জাতীয় আত্মীকরণের নিবৃত্তির জন্য একটি অ-রাজনৈতিকতার অছিলা অবলম্বন করা আমাদের কোনভাবেই উচিত নয়। তার পরিবর্তে, তাত্ত্বিক অব-উপনিবেশিকতার পুনর্বিবাচনা আমাদের আশু কর্তব্য।

*কিরা হিউয়ু অক্সফোর্ড স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানশিপের ফেলো। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড থেকে পিএইচ.ডি করেছেন এবং কসমোপলিটান এলিটজঃ ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটজ অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল হায়ারার্কিজ অফ গ্লোবাল অর্ডার*নামের তাঁর প্রথম মনোগ্রাফটি ২০২৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরিয়েছে।